জা আর্কাইভ
৪২৯

মুক্তি বাহিনীর শিবিরে শিবিরে

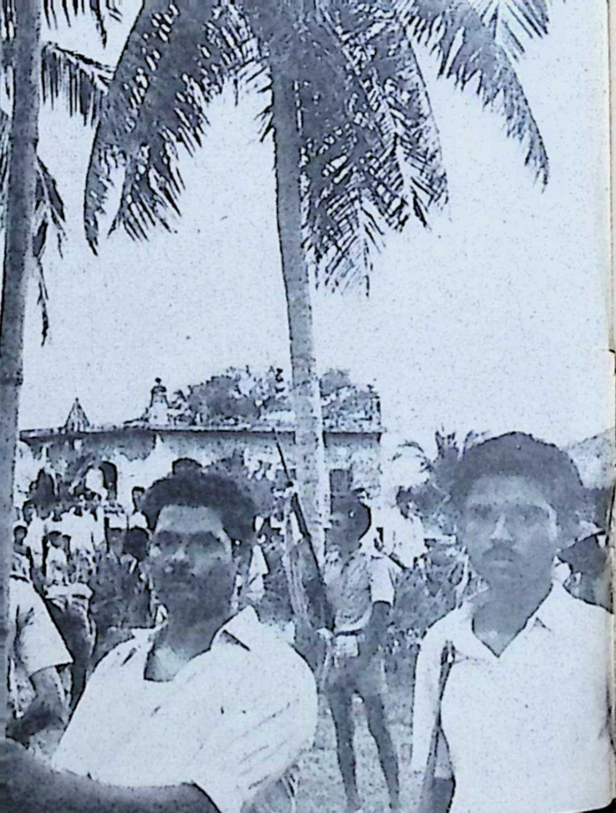

মুক্তিবাহিনীর শিবিরে শিবিরে

মুক্তিবাহিনীর শিবিরে শিবিরে
মহান মুক্তিবাহিনী। দূর থেকে
বেরিয়ে পড়লাম। ওরা কি করে,
থেকে যা ভেবেছি এবং কাছে এসে
কাছে এসে দেখি ওরা হাজার হাজার
লাখে। যেকোন শিবিরে গেছি, দে
ওদের চিহ্নিত করা যায়, তাহলে
হয়েছে। তৈরি হচ্ছে। যেকোন
এক গেরিলা শিবিরে বসে ওদের কথা

সাহিত্যবিশারদ
চট্টগ্রাম
বিশ্ববিদ্যালয়
জাদুঘর
সং নং......
চট্টগ্রাম

(

রেছি। ইয়াহিয়ার নর
া, একেবারে কাছে থেক
ভাবে, তা জানতে হবে
যা দেখছি—তাতে আ
—একজন মুক্তিযোদ্ধা
ছি আকাশ ভরা তারার
ঙলা ও বাঙালীর মহান
রে গেছি, প্রথমেই এই
নছি। এমন সময়

নিয়ে আক্রমণ চালালো। তারপর ফিরে গেলো বুকে হেঁটে। এরপর খানিকটা উবু হয়ে এবং শেষে দৌড় দিয়ে চোখের পলকে হারিয়ে গেলো। শত্রু-সেনারা তাদেরকে আর খুঁজেও পাবে না। কিছুক্ষণ পরে দেখি তারা হাজির হয়েছে মূল শিবিরে। সমগ্র মহড়াটিতে ব্যক্তির ওপর নয়, জোর দেওয়া হল দলের কার্যক্রমের ওপর। একজনের ভুলে সমগ্র দলটির বিপদ হতে পারে। তাই একজন গেরিলা আর একজন গেরিলার পরিপূরক, একজন আর একজনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। গেরিলার পদক্ষেপ তাই ব্যক্তির খেয়াল-খুশীর ব্যাপার নয়। লক্ষ্যবস্তুকে সামনে রেখে দলীয় ঐক্য ও শৃংখলার সাহায্যে শত্রু ধ্বংস করাই গেরিলা-দলের প্রধান কাজ। লক্ষ্যবস্তুর ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানতে হলে দলের প্রতিটি গেরিলার মধ্যে সহযোগিতা, সহমমিতা এবং বোঝাপড়া থাকা দরকার। এবং আমি দেখেছি, যেটুকু প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, তাতে এই দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্যই থাকছে। কিন্তু দলীয় শৃংখলার খাতিরে ব্যক্তিকে কোথাও ছোট করে দেখা হচ্ছে কিনা, আমি তাও লক্ষ্য করেছি। না, এরকম কোথাও ঘটেনি। গেরিলা–যুদ্ধ যে মূলতঃ প্রতিটি গেরিলার জন্য একটি সৃষ্টিধর্মী ব্যাপার, এক্ষেত্রে প্রত্যেকের মাথা খাটিয়ে নিজ নিজ বুদ্ধিমত যে কাজ করতে হবে, সে–বিষয়ে যথেষ্ট শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। আবার বলছি, পাটিগণিতের সংখ্যায় গেরিলা-বাহিনীর বীরযোদ্ধাদেরকে চিহ্নিত করতে চাই না। দলীয় আক্রমণের মধ্যেই ব্যক্তি তার প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পাচ্ছে। ব্যক্তির সাহস ও বীর্য দলকে যুগিয়ে যাচ্ছে প্রেরণা ; আবার দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী অর্থাৎ একসঙ্গে কাজ করবার, বাস করবার এবং যুদ্ধ করবার নীতি ব্যক্তিকে যোগাচ্ছে সাহস, ধৈর্য ও নৈতিক মনোবল। গেরিলাদের মহড়া থেকে আমি যা উপলব্ধি করেছি, তা কি বাস্তবে মানে বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে প্রতিফলিত হচ্ছে ? আনন্দের সঙ্গে বলছি, এই সেক্টরের একমাসের গেরিলা-যুদ্ধের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করলে আমার বক্তব্য পরিচ্ছন্নভাবে ধরা পড়বে।

কিন্তু তার আগে আর একটি মহড়ার কথা উল্লেখ করতে চাই। ঐ একই শিবিরের সামরিক শিক্ষক আমাকে নিয়ে গেলেন একটি নদীর ধারে। বললেন, খোঁজ নিয়ে জানা গেছে শত্রু–সেনারা নদীর ওপারে অবস্থান করছে। গেরিলারা এখন কি করবে ? অগ্রসর হবার নির্দেশ দিলেন তিনি। অমনি কাঁটা আর সদ্য-কাটা পাটের ক্ষেত পেরিয়ে কাদায়–জলে একাকার হয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে এলো গেরিলা-বাহিনী। ওরা নদী পেরোলো যেন হাঁসের মত, মাছের মত। জলে ঢেউ উঠলো না, শব্দ হলো না। প্রত্যেকের হাতে শক্তিশালী গ্রেনেড—প্রত্যেকের হাত ওপরে তোলা। তারপর আবার বুকে হেঁটে ওপরে ওঠা। আমি রুদ্ধনিশ্বাসে উৎকণ্ঠিত মুহূর্ত গুনছি। মনে হচ্ছিল, সত্যিকারের গেরিলা আক্রমণ দেখছি। ওরা শত্রু–ঘাঁটি ধ্বংস করে তিন তিনজন করে আবার নদীর কিনার ধরে নিঃশব্দে দূরে চলে গেল। তন্ময় হয়ে দেখছি। সময় যে কোথা দিয়ে চলে গেছে বুঝতে পারিনি। আমার সঙ্গী ফোটোগ্রাফার ততক্ষণে মহড়ার ছবি তুলেছে। কালের দলিল হয়ে থাকবে এসব ছবি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার উপাদান যোগাবে এই মহড়ার কাহিনী। কিন্তু এসবও আমার কাছে বড় কথা নয়। বাংলাদেশের শান্ত নিরীহ ছেলেরা সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করে গেরিলা যুদ্ধের শিক্ষা নিচ্ছে, এ ভাবতে গেলে অবাক লাগে। সমস্ত কষ্ট নীরবে মুখ বুজে সহ্য করছে দেশমাতাকে মুক্ত করবার জন্য। সামরিক শিক্ষার মধ্যে যে ভীষণ এবং প্রায়-বিশুষ্ক একটা দিক আছে, যুবক ও ছাত্রেরা সেটা মেনে নিয়েছে দেখে প্রাণ আনন্দে ভরে যায়।

(তিন)

প্রতিদিন ছেলেরা আসছে এই সেক্টরের বিভিন্ন জেলা ও অঞ্চল থেকে। তাদের থাকবার জন্য তৈরি হয়েছে ‘যুব অভ্যর্থনা শিবির’। ‘যুব অভ্যর্থনা শিবির’ থেকে বাছাই করে ছেলেদেরকে পাঠানো হচ্ছে ‘যুব শিক্ষা শিবিরে’। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর এদেরকে অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করার জন্য শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। প্রতিটি শিবিরের জন্য তাই গড়ে তুলতে হয়েছে প্রশাসন বিভাগ। প্রতিটি শিবিরে ২০/২২ জন কর্মচারী নিয়ে গঠিত হয়েছে প্রশাসন বিভাগ। রেশন সংগ্রহ, রান্না, চিকিৎসা ও সবশেষে সামরিক শিক্ষন প্রভৃতি প্রতিটি শিবিরের অঙ্গ। কারো কাজ ছোট নয়, কারো কাজ বড়ও নয়। তাই সবার কাজ দেখেছি। একটি যুব অভ্যর্থনা শিবিরে দেখতে গেলাম কিভাবে রান্নাবান্না হচ্ছে। বড় বড় ডেকচিতে রান্না হচ্ছে। এক একজন কর্মী গলদঘর্ম হচ্ছে। তবু কারো ক্লান্তি নেই। শিবিরে যিনি রান্নাবান্নার তদারক করছেন, তাকে দেখলাম গামছা দিয়ে মুখ মুছচেন। জিজ্ঞেস করলাম কেমন চলছে আপনার বিভাগ ? বললেন, চলছে ভালো, তবে সবসময়ই নতুন মুখ আসছে, রেশনে কুলোচ্ছে না। একথাটি শুনেছি সব শিবিরে। তবু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় সাড়ে সাত'শ লোকের রেশনে খাচ্ছে প্রায় বারো'শ মানুষ। ওদের সঙ্গে সেদিন

নিয়ে আক্রমণ চালালো। তারপর ফিরে গেলো বুকে হেঁটে। এরপর খানিকটা উবু হয়ে এবং শেষে দৌড় দিয়ে চোখের পলকে হারিয়ে গেলো। শত্রু-সেনারা তাদেরকে আর খুঁজেও পাবে না। কিছুক্ষণ পরে দেখি তারা হাজির হয়েছে মূল শিবিরে। সমগ্র মহড়াটিতে ব্যক্তির ওপর নয়, জোর দেওয়া হল দলের কার্যক্রমের ওপর। একজনের ভুলে সমগ্র দলটির বিপদ হতে পারে। তাই একজন গেরিলা আর একজন গেরিলার পরিপূরক, একজন আর একজনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। গেরিলার পদক্ষেপ তাই ব্যক্তির খেয়াল-খুশীর ব্যাপাব নয়। লক্ষ্যবস্তুকে সামনে রেখে দলীয় ঐক্য ও শৃংখলার সাহায্যে শত্রু ধ্বংস করাই গেরিলা-দলের প্রধান কাজ। লক্ষ্যবস্তুর ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানতে হলে দলের প্রতিটি গেরিলার মধ্যে সহযোগিতা, সহমমিতা এবং বোঝাপড়া থাকা দরকার। এবং আমি দেখেছি, যেটুকু প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, তাতে এই দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্যই থাকছে। কিন্তু দলীয় শৃংখলার খাতিরে ব্যক্তিকে কোথাও ছোট করে দেখা হচ্ছে কিনা, আমি তাও লক্ষ্য করেছি। না, এরকম কোথাও ঘটেনি। গেরিলা–যুদ্ধ যে মূলতঃ প্রতিটি গেরিলার জন্য একটি সৃষ্টিধর্মী ব্যাপার, এক্ষেত্রে প্রত্যেকের মাথা খাটিয়ে নিজ নিজ বুদ্ধিমত যে কাজ করতে হবে, সে–বিষয়ে যথেষ্ট শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। আবার বলছি, পাটিগণিতের সংখ্যায় গেরিলা-বাহিনীর বীরযোদ্ধাদেরকে চিহ্নিত করতে চাই না। দলীয় আক্রমণের মধ্যেই ব্যক্তি তার প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পাচ্ছে। ব্যক্তির সাহস ও বীর্য দলকে যুগিয়ে যাচ্ছে প্রেরণা ; আবার দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী অর্থাৎ একসঙ্গে কাজ করবার, বাস করবার এবং যুদ্ধ করবার নীতি ব্যক্তিকে যোগাচ্ছে সাহস, ধৈর্য ও নৈতিক মনোবল। গেরিলাদের মহড়া থেকে আমি যা উপলব্ধি করেছি, তা কি বাস্তবে মানে বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে প্রতিফলিত হচ্ছে ? আনন্দের সঙ্গে বলছি, এই সেক্টরের একমাসের গেরিলা-যুদ্ধের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করলে আমার বক্তব্য পরিচ্ছন্নভাবে ধরা পড়বে।

কিন্তু তার আগে আর একটি মহড়ার কথা উল্লেখ করতে চাই। ঐ একই শিবিরের সামরিক শিক্ষক আমাকে নিয়ে গেলেন একটি নদীর ধারে। বললেন, খোঁজ নিয়ে জানা গেছে শত্রু–সেনারা নদীর ওপারে অবস্থান করছে। গেরিলারা এখন কি করবে ? অগ্রসর হবার নির্দেশ দিলেন তিনি। অমনি কাঁটা আর সদ্য-কাটা পাটের ক্ষেত পেরিয়ে কাদায়–জলে একাকার হয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে এলো গেরিলা-বাহিনী। ওরা নদী পেরোলো যেন হাঁসের মত, মাছের মত। জলে ঢেউ উঠলো না, শব্দ হলো না। প্রত্যেকের হাতে শক্তিশালী গ্রেনেড—প্রত্যেকের হাত ওপরে তোলা। তারপর আবার বুকে হেঁটে ওপরে ওঠা। আমি রুদ্ধনিশ্বাসে উৎকণ্ঠিত মুহূর্ত গুনছি। মনে হচ্ছিল, সত্যিকারের গেরিলা আক্রমণ দেখছি। ওরা শত্রু–ঘাঁটি ধ্বংস করে তিন তিনজন করে আবার নদীর কিনার ধরে নিঃশব্দে দূরে চলে গেল। তন্ময় হয়ে দেখছি। সময় যে কোথা দিয়ে চলে গেছে বুঝতে পারিনি। আমার সঙ্গী ফোটোগ্রাফার ততক্ষণে মহড়ার ছবি তুলেছে। কালের দলিল হয়ে থাকবে এসব ছবি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার উপাদান যোগাবে এই মহড়ার কাহিনী। কিন্তু এসবও আমার কাছে বড় কথা নয়। বাংলাদেশের শান্ত নিরীহ ছেলেরা সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করে গেরিলা যুদ্ধের শিক্ষা নিচ্ছে, এ ভাবতে গেলে অবাক লাগে। সমস্ত কষ্ট নীরবে মুখ বুজে সহ্য করছে দেশমাতাকে মুক্ত করবার জন্য। সামরিক শিক্ষার মধ্যে যে ভীষণ এবং প্রায়-বিশুষ্ক একটা দিক আছে, যুবক ও ছাত্রেরা সেটা মেনে নিয়েছে দেখে প্রাণ আনন্দে ভরে যায়।

(তিন)

প্রতিদিন ছেলেরা আসছে এই সেক্টরের বিভিন্ন জেলা ও অঞ্চল থেকে। তাদের থাকবার জন্য তৈরি হয়েছে 'যুব অভ্যর্থনা শিবির'। 'যুব অভ্যর্থনা শিবির' থেকে বাছাই করে ছেলেদেরকে পাঠানো হচ্ছে 'যুব শিক্ষা শিবিরে'। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর এদেরকে অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করার জন্য শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। প্রতিটি শিবিরের জন্য তাই গড়ে তুলতে হয়েছে প্রশাসন বিভাগ। প্রতিটি শিবিরে ২০/২২ জন কর্মচারী নিয়ে গঠিত হয়েছে প্রশাসন বিভাগ। রেশন সংগ্রহ, রান্না, চিকিৎসা ও সবশেষে সামরিক শিক্ষন প্রভৃতি প্রতিটি শিবিরের অঙ্গ। কারো কাজ ছোট নয়, কারো কাজ বড়ও নয়। তাই সবার কাজ দেখেছি। একটি যুব অভ্যর্থনা শিবিরে দেখতে গেলাম কিভাবে রান্নাবান্না হচ্ছে। বড় বড় ডেকচিতে রান্না হচ্ছে। এক একজন কর্মী গলদঘর্ম হচ্ছে। তবু কারো ক্লান্তি নেই। শিবিরে যিনি রান্নাবান্নার তদারক করছেন, তাকে দেখলাম গামছা দিয়ে মুখ মুছচেন। জিজ্ঞেস করলাম কেমন চলছে আপনার বিভাগ ? বললেন, চলছে ভালো, তবে সবসময়ই নতুন মুখ আসছে, রেশনে কুলোচ্ছে না। একথাটি শুনেছি সব শিবিরে। তবু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় সাড়ে সাত'শ লোকের রেশনে খাচ্ছে প্রায় বারো'শ মানুষ। ওদের সঙ্গে সেদিন

দুপুরের খাবার খেতে বসেছি। রান্না বিভাগের পরিচালক একটি ছেলেকে দেখে বললেন, কি হে তুমি না আগের পংক্তিতে বসে খেয়ে গেলে। ছেলেটা লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। সস্নেহে বললেন, কি জানেন ভাই, বাংলাদেশের ছেলেরা এতদিন ধরে পেট ভরে ভাত খেয়েছে, শিবিরে তো আমরা সেটুকু দিতে পারছি না। বরাদ্দ রেশনে বাড়তি মুখকে খেতে দিতে হচ্ছে। যে-ছেলেটা ভাত দিচ্ছিল তাকে বলে দিলেন, দাও ওকে একটু বেশি করে ভাত দাও। ও যেন কি একটা বলতে যাচ্ছিল, বললেন ভাত না থাকে—আমার ভাগ থেকে দাও। পরে আমাকে বলেছিলেন, মা বাবা ভাইবোন বাড়ীঘর সব ওরা ছেড়ে এসেছে। কে ওদের দেখবে, বলুন। বলেই অন্যদিকে মুখ ফেরালেন। জানি না অশ্রুতে সেই মাঝ–বয়সী মানুষটির চোখ ছলছল করছিল কিনা।

যুব শিবিরে কি কি অসুখ-বিসুখ হচ্ছে, খোঁজ নিতে গিয়েছি শিবিরের চিকিৎসা বিভাগে। ডাক্তার জানালেন, ওষুধের বড় অভাব। এক একদিনে চল্লিশেরও বেশি পেনিসিলিন খরচ হচ্ছে। শিবিরে সর্দি-কাশি হচ্ছে ব্যাপক আকারে। এরপরে পেটের অসুখ-বিসুখ। এলার্জিও হচ্ছে খুব। বললেন, আমরা যতটা পারি করছি। যুব শিবিরে আমি মুক্তিবাহিনীর ভাইদের সঙ্গে একই সঙ্গে রাত কাটিয়েছি একই বিছানায়। বালিশ নেই, মশারি নেই, তোষক নেই। চারিদিকে স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া। কিন্তু কারো মনে দুঃখ নেই। মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য সবাই সর্বস্ব পণ করেছে। স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা একই সঙ্গে হাসিমুখে সুখ–দুঃখ সমান ভাগে ভাগ করে নিচ্ছে। প্রতিটি শিবিরে ছাত্রদের সংখ্যাই সর্বাধিক। শতকরা কুড়ি ভাগ ছেলে এসেছে চাষী পরিবার ও মজুর পরিবার থেকে। কোন কোন শিবিরে শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ ছেলে এসেছে হিন্দু সম্প্রদায় থেকে। শিবিরগুলিতে সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন নেই কোথাও। না দেখলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। শিক্ষিতের সঙ্গে অশিক্ষিতের, হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান, চাষীর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, মজুরের সঙ্গে ধনীর সন্তান—সবাই একই সঙ্গে কাজ করছে। একজন তরুণ অধ্যাপক একটি যুব–শিবিরের সহ–পরিচালকের কাজ করছে। তিনি বললেন, এই শিবির ছেড়ে কোথাও দু'দণ্ড থাকতে পারি না। এদেরকে ভালোবেসে ফেলেছি। এমনি আরো অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা হয়েছে। কেউ শিবিরের 'রাজনৈতিক শিক্ষকে'র (Political Motivator) কাজ করছেন, কেউ-বা শিবিরের অধ্যক্ষ হয়েছেন। প্রাক্তন সরকার ও বেসরকারী কর্মচারীরাও বিভিন্ন শিবিরের প্রশাসনিক কাজকর্ম করছেন। ছাত্র-আন্দোলনের বহু নেতা ও কর্মীও শিবিরে কাজ করছেন, তদারক করছেন। একটা বিপুল কর্মোদ্যোগের সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন বহু মানুষ, বহু শ্রেণীর মানুষ। একটি শিবিরে দেখলাম কোন একটি নামকরা কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি রাজনৈতিক শিক্ষকের কাজ করছেন। 'রাজনৈতিক শিক্ষকেরা' তরুণদের মধ্যে দেশপ্রেমের বীজ উপ্ত করছেন। পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের রাজনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আলোচনা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। যুবকদের মধ্যে নৈতিক আদর্শ যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তার জন্যেও বিশেষ শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। একজন ক্যাপ্টেন আমাকে বলেছিলেন, অস্ত্রের চাইতেও বড় প্রয়োজন রাজনৈতিক শিক্ষার। প্রতিটি গেরিলা যাতে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির কথা জানতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। পশ্চিম-পাকিস্তানী পুঁজি কিভাবে বাংলাদেশকে শোষণ করেছে এবং এই শোষণকে রুখতে গিয়ে বাংলাদেশে কিভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তার ইতিহাসও জানা প্রয়োজন। প্রতিটি রাজনৈতিক শিক্ষক আমাকে জানিয়েছেন যে বাংলাদেশসংক্রান্ত বইপুঁথির অভাবের কথা।

একদিন যাদের সুখের সংসার ছিল, ঘরে দুটো লাউ-কুমড়োর জাংলা ছিল, দুধেল গাই ছিল, নদীতে-পুকুরে মাছ ছিল, ছায়াচ্ছন্ন মায়াময় স্নেহাদরে পরিপূর্ণ গৃহ ছিল, আজ তারা সব ত্যাগ করে বাংলা মাকে মুক্ত করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী শত্রু-সেনাদের কাছ থেকে কেড়ে এনেছে অনেক লঞ্চ। এইসব লঞ্চ যাঁর তদারকিতে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল একটি নদী-বন্দরে। তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনার পরিবার মানে আপনার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা কোথায়? বলেছিলেন, ওরা আছে বাঙলাদেশের ভেতরে। ওদের আনলেন না কেন, জিজ্ঞেস করেছিলাম। বললেন, বাংলাদেশের প্রতি, বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আমার যে-আনুগত্য তাকে আমি দু'ভাগে বিভক্ত করতে পারছি না। যতদিন দেশ মুক্ত না হয়, ততদিন বাংলাদেশ থাকবে আমার ধ্যানে, আমার চিন্তায়, আমার মননে। প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করে লজ্জায় পড়েছিলাম। এমন করে বঙ্গজননীর কথা আর কেউ ভাবছে কিনা জানিনা। কিন্তু শ্রদ্ধায় মাথা আমার নত হয়েছিল সেদিন।

দুপুরের খাবার খেতে বসেছি। রান্না বিভাগের পরিচালক একটি ছেলেকে দেখে বললেন, কি হে তুমি না আগের পংক্তিতে বসে খেয়ে গেলে। ছেলেটা লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। সস্নেহে বললেন, কি জানেন ভাই, বাংলাদেশের ছেলেরা এতদিন ধরে পেট ভরে ভাত খেয়েছে, শিবিরে তো আমরা সেটুকু দিতে পারছি না। বরাদ্দ রেশনে বাড়তি মুখকে খেতে দিতে হচ্ছে। যে-ছেলেটা ভাত দিচ্ছিল তাকে বলে দিলেন, দাও ওকে একটু বেশি করে ভাত দাও। ও যেন কি একটা বলতে যাচ্ছিল, বললেন ভাত না থাকে—আমার ভাগ থেকে দাও। পরে আমাকে বলেছিলেন, মা বাবা ভাইবোন বাড়ীঘর সব ওরা ছেড়ে এসেছে। কে ওদের দেখবে, বলুন। বলেই অন্যদিকে মুখ ফেরালেন। জানি না অশ্রুতে সেই মাঝ–বয়সী মানুষটির চোখ ছলছল করছিল কিনা।

যুব শিবিরে কি কি অসুখ-বিসুখ হচ্ছে, খোঁজ নিতে গিয়েছি শিবিরের চিকিৎসা বিভাগে। ডাক্তার জানালেন, ওষুধের বড় অভাব। এক একদিনে চল্লিশেরও বেশি পেনিসিলিন খরচ হচ্ছে। শিবিরে সর্দি-কাশি হচ্ছে ব্যাপক আকারে। এরপরে পেটের অসুখ-বিসুখ। এলার্জিও হচ্ছে খুব। বললেন, আমরা যতটা পারি করছি। যুব শিবিরে আমি মুক্তিবাহিনীর ভাইদের সঙ্গে একই সঙ্গে রাত কাটিয়েছি একই বিছানায়। বালিশ নেই, মশারি নেই, তোষক নেই। চারিদিকে স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া। কিন্তু কারো মনে দুঃখ নেই। মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য সবাই সর্বস্ব পণ করেছে। স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা একই সঙ্গে হাসিমুখে সুখ–দুঃখ সমান ভাগে ভাগ করে নিচ্ছে। প্রতিটি শিবিরে ছাত্রদের সংখ্যাই সর্বাধিক। শতকরা কুড়ি ভাগ ছেলে এসেছে চাষী পরিবার ও মজুর পরিবার থেকে। কোন কোন শিবিরে শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ ছেলে এসেছে হিন্দু সম্প্রদায় থেকে। শিবিরগুলিতে সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন নেই কোথাও। না দেখলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। শিক্ষিতের সঙ্গে অশিক্ষিতের, হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান, চাষীর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, মজুরের সঙ্গে ধনীর সন্তান—সবাই একই সঙ্গে কাজ করছে। একজন তরুণ অধ্যাপক একটি যুব–শিবিরের সহ–পরিচালকের কাজ করছে। তিনি বললেন, এই শিবির ছেড়ে কোথাও দু'দণ্ড থাকতে পারি না। এদেরকে ভালোবেসে ফেলেছি। এমনি আরো অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা হয়েছে। কেউ শিবিরের 'রাজনৈতিক শিক্ষকে'র (Political Motivator) কাজ করছেন, কেউ-বা শিবিরের অধ্যক্ষ হয়েছেন। প্রাক্তন সরকার ও বেসরকারী কর্মচারীরাও বিভিন্ন শিবিরের প্রশাসনিক কাজকর্ম করছেন। ছাত্র-আন্দোলনের বহু নেতা ও কর্মীও শিবিরে কাজ করছেন, তদারক করছেন। একটা বিপুল কর্মোদ্যোগের সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন বহু মানুষ, বহু শ্রেণীর মানুষ। একটি শিবিরে দেখলাম কোন একটি নামকরা কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি রাজনৈতিক শিক্ষকের কাজ করছেন। 'রাজনৈতিক শিক্ষকেরা' তরুণদের মধ্যে দেশপ্রেমের বীজ উপ্ত করছেন। পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের রাজনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আলোচনা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। যুবকদের মধ্যে নৈতিক আদর্শ যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তার জন্যেও বিশেষ শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। একজন ক্যাপ্টেন আমাকে বলেছিলেন, অস্ত্রের চাইতেও বড় প্রয়োজন রাজনৈতিক শিক্ষার। প্রতিটি গেরিলা যাতে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির কথা জানতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। পশ্চিম-পাকিস্তানী পুঁজি কিভাবে বাংলাদেশকে শোষণ করেছে এবং এই শোষণকে রুখতে গিয়ে বাংলাদেশে কিভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তার ইতিহাসও জানা প্রয়োজন। প্রতিটি রাজনৈতিক শিক্ষক আমাকে জানিয়েছেন যে বাংলাদেশসংক্রান্ত বইপুঁথির অভাবের কথা।

একদিন যাদের সুখের সংসার ছিল, ঘরে দুটো লাউ-কুমড়োর জাংলা ছিল, দুধেল গাই ছিল, নদীতে-পুকুরে মাছ ছিল, ছায়াচ্ছন্ন মায়াময় স্নেহাদরে পরিপূর্ণ গৃহ ছিল, আজ তারা সব ত্যাগ করে বাংলা মাকে মুক্ত করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী শত্রু-সেনাদের কাছ থেকে কেড়ে এনেছে অনেক লঞ্চ। এইসব লঞ্চ যাঁর তদারকিতে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল একটি নদী-বন্দরে। তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনার পরিবার মানে আপনার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা কোথায়? বলেছিলেন, ওরা আছে বাঙলাদেশের ভেতরে। ওদের আনলেন না কেন, জিজ্ঞেস করেছিলাম। বললেন, বাংলাদেশের প্রতি, বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আমার যে-আনুগত্য তাকে আমি দু'ভাগে বিভক্ত করতে পারছি না। যতদিন দেশ মুক্ত না হয়, ততদিন বাংলাদেশ থাকবে আমার ধ্যানে, আমার চিন্তায়, আমার মননে। প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করে লজ্জায় পড়েছিলাম। এমন করে বঙ্গজননীর কথা আর কেউ ভাবছে কিনা জানিনা। কিন্তু শ্রদ্ধায় মাথা আমার নত হয়েছিল সেদিন।

মস্ত সামরিক আক্রমণে অংশগ্রহণ করেছে, তার বিশ্লেষণ
র যথা ঃ—

রা। এদের মধ্যে রয়েছে মুসলিম লীগের নেতা ও কর্মী,
সদস্য প্রভৃতি।
এবং স্থানীয় বাঙালীদের দিয়ে তৈরি রাজাকার বাহিনীকে

রুদ্ধে সরাসরি এবং মুখোমুখি সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া এবং

বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছেন। ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ,
লাল ও তল্পীবাহকদের খতম করে মুক্তিবাহিনী নিজেদের
র হাজার তরুণ যুব অভ্যর্থনা শিবিরে এসে যোগ দিতে
রে আসবার রাস্তা সুগম করতে পেরেছেন। কিন্তু দ্বিতীয়
চ্ছিন্ন করা সম্ভব। আর তাই রাজাকারদের বিরুদ্ধে চলছে
। ফলে নৈতিক দিক থেকে মুক্তিযোদ্ধারা জয়লাভ করে
ও ভাঙন। এই সেক্টরে ৬০/৭০ জন রাজাকার ইতিমধ্যেই
াযোগ করেছে রাজাকার বাহিনীর দলপতিরা। নিরাপত্তার
বলে জানানো হয়েছে। বাঙালীকে দিয়ে বাঙালী হত্যার

যে-পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে চলেছে
এখন নামে মাত্র বিরাজ করছে। শান্তি কমিটির বহুসংখ্যক
আশ্রয় নিয়েছে শত্রু অধিকৃত শহরাঞ্চলে।

বর্বর পাক সেনাদের সঙ্গে মুখোমুখী যুদ্ধে গেরিলাদে
মনে রাখতে হবে গেরিলা বন্ধুরা সামান্য রাইফেল, হাতবোমা
ব্যবহার করতে পেরেছে। অন্যদিকে পাক-সেনারা মার্কিন
আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। গেরিলাদের অবলম্বিত কৌশল
স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর যথার্থ স্বরূ
ধরছি। এগুলোর বিশ্লেষণ করলেই ধরা পড়বে, বাংলাদেশের

ক. হরিনগরের যুদ্ধ

বলছিলেন ক্যাপ্টেন জয়। তরুণ এই যোদ্ধা তাঁর
আর হয়ে উঠলো না। নদীর বাঁকে দেখা দিয়েছে শত্রু সেন
লঞ্চে পাকসেনারা। ক্যাপ্টেন জয় চিন্তান্বিত হলেন মুহ
দিতেই হবে। নদীবক্ষে এগিয়ে আসছে শত্রুসেনা। নদী
বাজে। ক্যাপ্টেন জয় নির্দেশ দিলেন পজিসন নেবার জন
এল, এম, জি থেকে ছুটলো গুলি। 'সিলেট-৪'-এর ওয়ার
পেছনের গানার তখনও খাড়া রয়েছে যে, ভাবলেন জয়
ও পেছনের দুজন গানার নিহত হওয়ার অন্য কোন গানারের
বিধ্বস্ত 'সিলেট-৪'-কে এবার পর্দায় ঢেকে দিয়ে পেছন দিকে

না ছিল রিকয়েললেস রাইফেল। এ-জাতীয় রাইফেল হল
গজ কিন্তু এগুলো সাতহাজার গজ পর্যন্ত আঘাত হানতে পারে।
, শেখ মুজিবুর রহমানের এক আত্মীয়। তিনি বলছিলেন,
পালা ভেঙ্গে পড়ছিল। কানে তালা ধরে গিয়েছিল। ক্যাপ্টেন
ল কিছু রাইফেল ও দুটি এল, এম, জি—তাও আবার এক সময়
কিন্তু আবার নদীর বাঁকে দেখা দিয়েছে নতুন গানবোট। আর
দূরে দেখা যাচ্ছে পাকসেনারা স্থলপথে ও নদীপথে তাদেরকে
জের অবস্থান ত্যাগ করে ফিরে এলো। এই যুদ্ধে পাকসেনাদের
াধন করে মুক্তিবাহিনী। এ-যুদ্ধে সাতজন পাকসেনা নিহত হয়।
ংখ্যা আক্রমণ পরিচালনা করেছেন জয় এই একই খুলনা জেলায়।

হবিবপুরে এসেছে পাকসেনারা। গানবোট ছাড়াও সঙ্গে লঞ্চ।
। সবশুদ্ধ চারশতেরও অধিক ওরা। অন্যদিকে মুক্তিবাহিনীতে
স্থান করছিল পূর্ব থেকেই। কাজেই ৩২ জনের এই বীর বাহিনী
নদীপারের অধিক সুবিধে-সম্পন্ন অবস্থান থেকে আক্রমণ চালালো
। পাকসেনারা ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয় রাইফেল এবং রকেট।
এ-যুদ্ধে পাকসেনা, রেঞ্জার্স, পুলিশ ও রাজাকার মিলিয়ে নিহত
নবোটের ক্ষতিসাধন করা যায় নি। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ স্বাধীনতা-
বিবপুরের যুদ্ধ তার প্রমাণ!

গ. বানোরীপাড়ার যুদ্ধ

২৫শে মার্চের পর থেকে হানাদার পাক সেনাবাহি
ছিল শহর–বন্দরগুলিকে ধ্বংস করে দেয়া ও নিবিচা
রণকৌশলের প্রণেতা টিক্কা খান নিজের কৌশলে নিজেই
কাটিয়ে সংগঠিত হয়েছে গত জুন মাস থেকে। আ
দেখেছিল তা ব্যর্থ হয়ে যায়। ভয় পাওয়া তো দূরের ক
আশ্রয় ও খাদ্য প্রদান করে' জনগণ মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে
নিতে হয় এবং পাক সেনাবাহিনী নতুন রণ কৌশল প্র
সেনাবাহিনীর জন্য সুরক্ষিত অবস্থান রচনা করা।
হত আক্রমণের উদ্দেশ্যে। হাতে প্রচুর শক্তিশালী অস্ত্র,
ভুলই করে থাকে। যাই হোক, দ্বিতীয় দফায় রণ–
নির্দেশ দেওয়া হয়।

বানোরীপাড়া থানাকে সুরক্ষিত অবস্থানে উন্নীত ক
অন্তর অন্তর ফুটো রাখা হয়, যাতে বাইরের দিক
হয় পাকা বাঙ্কার ও ট্রেঞ্চ। আর এই সুরক্ষিত দুর্গের
গ্রহণ করে। দিনের বেলায় এই 'বাহাদুর জোয়ানে–
আশ্রয় গ্রহণ করে। রাতের বেলায় তাদের টিকিটিও

হবিবপুরের যুদ্ধের পর একদল গেরিলা সেখানেই
শিবিরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। পথে বানোরীপাড়ার

মণের জন্য প্রস্তুত হয়। একজন দুঃসাহসী গেরিলা থানা
ীছায়। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে থানার ভেতরে সে ছুঁড়ে মারে
আমাকে বলেছিল, হাতবোমাটি ফাটবার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানী
অধিনায়ক পায়ের গোড়ালিতে গুলির আঘাত সত্ত্বেও হামাগুড়ি
ানার অভ্যন্তরে নির্মিত বাঙ্কারটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।

ক ঘিরে আওয়াজ তোলে জয়বাংলা, শেখ মুজিবুর জিন্দাবাদ।
া, আমি তোমায় ভালবাসি'।

ত হবে শত্রু অধিকৃত মঙ্গলা বন্দরে। যেই কথা সেই কাজ।
সংখ্য নদ-নদী পরিবৃত সুন্দরবন এলাকা দিয়ে চলেছে ওদের
খা হতে পারে সশস্ত্র ডাকাত বা রাজাকারদের সঙ্গে। তাই
বং সাবের। না খুব বড় বিপদ রাস্তায় হয় নি বটে। কিন্তু
দেশে তো আইন-কানুনের বালাই নেই। জনপদে জনপদে
ক ফাঁকা আওয়াজ করলাম—দেখি কোনো জবাব আসে কিনা
ী ডাকাতের দল ভেবেছিল শিকার পাওয়া গেছে। তাই অতি
ক্রমণ চালিয়ে ৭ জন ডাকাতকে নিহত করে এবং ওদের কাছ

নিবিঘ্ন হয়ে ওরা আবার এগিয়ে যায় লক্ষ্যব
ওয়ারলেসে খবর আসে—বন্ধুগণ আক্রমণ কর। পনেরো
সঙ্গে। তাঁরা বন্ধুর মত পথ বাতলে দিয়েছেন। নি
গাছের ওপরে বন্দুক হাতে একজন লোক। গুলি করতে
মুক্তিবাহিনীর বন্ধু। কতদিন থেকে তোমাদের পথ
যে তাই। লোকটা খাসী ধরে রেখেছে সেই কবে থেকে,
কথায় কথায় কথা বাড়ে, পরিচয় হলে দেখা গেল লো
তার মা–বোন। একজন গেরিলা আমাকে বলছিলেন,
খাওয়াবার জন্যে খাসী-মুরগী জবাই করা হয়েছিল।
করা খাবার নষ্ট হয়েছে। চারিদিকে নিদারুণ অভাব
প্রতি সের ৮ থেকে ১০ টাকা, কেরোসিন প্রতি সের ৭৫
জন্য কোনো অভাব নেই। যেখানেই যাক্ ওরা, ওদে
জয় ও সাবের। সুন্দরবনের কোথাও থাকা কিংবা খাওয়া

আক্রমণের সময় ঘনিয়ে আসছে। পনেরো অ
ওদের সম্বিৎ ফিরিয়ে দেয়। ১৬ তারিখই হলো নিদিষ্ট
এগিয়ে যাও। সারা রাত ধরে প্রতীক্ষা। জয় ও সাবের
হও। না, ওরা তৈরি হয়েই ছিল। শুধু হুকুমের অ
এল, এম জি, নিয়ে বসে—নিঃশ্বাস বন্ধ করে ওরা বসে আ
যাচ্ছে ওরা হাঁসের মত, জলে ঢেউ উঠছে না, শব্দ হচ্ছে

্য দুজন ফ্রগম্যান—দুজন ব্যাঙ-রাজকুমার। ওরা দলে ছিল
তলায় তলায় বসিয়ে দিচ্ছে মাইন। ঐ তো মাকিন জাহাজ
লো ওপরে দাঁড়িয়ে কেন? টের পেয়েছে বুঝি। হ্যাঁ টের
করে নি। তরুণ গেরিলা মুখাজির সামান্য ভুলে শব্দ হয়েছিল
র মধ্যে সে তার কাপড়-চোপড় খুলে ফেলে উলঙ্গ হয়ে যায়।
'আমার বাবা কই,' বলে। চীনেরা ওকে উন্মাদ ভেবে নৌকোয়
তখন ফিরে গেছে। তীরে পৌঁছতে পৌঁছতেই বিস্ফোরণের
চ্যাকা খেয়ে গেল। মোট ছখানি জাহাজে একইসঙ্গে বিস্ফোরণ
জাহাজ, দুটি চীনে জাহাজ একখানি পাকিস্তানী জাহাজ সেদিন
হল গেরিলা তৎপরতা আর শেষ হয়েছিল ছয়টায়। হ্যাঁ ষোলই
দিন।

ীহ-নিম্মিত লঞ্চ অধিকার করে—নাম 'বনবালা' এবং 'বনমৃগী'।
সেট্, ২৬টি শটগান, ৮টি ·৩০৩ রাইফেল, ·৩২ পিস্তল দুটি,
রি ১০০টি গুলি, ৭টি পেট্রোম্যাক্স, ১টি রেডিও ও ১টি রেকর্ড-
খালীতে গেরিলাবাহিনী ৩৯ জন রাজাকারকে হত্যা করে—আর

ঘুরেছি রূপকথা সংগ্রহের কাজে। একদিন একটা কাহিনী
তার ধনশালায় ধন আছে, হাতীশালায় আছে হাতী, ঘোড়াশালে
নই। তার ছেলেপুলে নেই। অনেক দান-খয়রাত, অনেক

যাগ-যজ্ঞ করে তিনি বর পেলেন। ছোট রাণীর গর্ভে
রাণী কিন্তু প্রসব করলেন এতোটুকুন একটা ব্যাঙ। রা
রাণীকে। কি আর করবেন, মনের দুঃখে ব্যাঙ-সন্তান
করে ২৪টি বছর গেল। সেদিনের সেই শিশু-ব্যাঙ এতা
কথা সে বোঝে। হেন সময় ছোটরাণী খবর পেলে
যত কষ্টই হোক, স্বামীর অমঙ্গল কামনা করেন নি রাণ
না পেরে মা তাকে সব কথা বুঝিয়ে বললো। ব্য
পরাস্ত করব। শত দুঃখেও মার হাসি পায়। ব্যাঙ হ

থপ থপ থপ থপ......

চলতে চলতে একেবারে রাজার দরবারে। রাজ
থপ। সামনের দুপা তুলে ব্যাঙ সেলাম দিলে রাজাকে।
এসেছে। শুনে তো সবাই আর এক দফা হাসলো। ব
গায়ে জ্বালা ধরে গেল। এই অপমান তার সহ্য হ
লম্বা হলো—আর অমনি ব্যাঙের খোলসটা ফেটে চৌচির
লজ্জিত। ব্যাঙ-রাজকুমার চব্বিশ বছর অপেক্ষা কর
বনবাসিনী মাতাকে নিয়ে আলোকোজ্জ্বল মঞ্চে দিয়ে আস

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট যে-শিশুর জন্ম হ
থেকে এই ২৪ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেদিন যার
এদেরকে সামরিক পরিভাষায় বলে ফ্রগম্যান (FRO

সন্তান। এতদিন তাদের অঙ্গে ছিল দাসত্বের খোলস। ২৪ বছরের অভিশাপ থেকে আজ তাদের মুক্তি ঘটেছে। খোলস ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে চব্বিশ বছর বয়সের দিব্য তারুণ্য। আজ আর তাদের রোখে কে? ওরাই হতভাগিনী বাংলাদেশকে নিয়ে যাবে স্বাধীনতার আলোকোজ্জ্বল মহা-মহীয়ান পথে। যৌবনের মুক্তিতেই দেশ-মাতৃকার মুক্তি।

না মুক্তিবাহিনীকে সংখ্যায় নয়, গুণগত উৎকর্ষেই চিহ্নিত করতে চাই। ওরা শুধু সংখ্যা নয়, দেশপ্রেম ওদেরকে অনির্বাণ অগ্নিশিখায় পরিণত করেছে।

(পাঁচ)

মুক্তিবাহিনীর শিবিরে শিবিরে ঘুরছি। ছেলেদের সঙ্গে কথা বলছি। ওদেরকে জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করছি। ওদের কাছ থেকে শেখার চেষ্টা করছি। এতকাল ওদের বয়সী ছেলেদেরকে আমি পড়িয়েছি আর আজ আমি ওদেরই ছাত্র হয়েছি। মনে মনে ভেবেছি, যুদ্ধ আর যুদ্ধাস্ত্রের আমি কিই-বা বুঝি! ওসব ওদের কাছ থেকেই শিখতে হবে। বিনীত বাধ্য ছাত্রের মতই শিবিরে শিবিরে গিয়েছি শেখবার উদ্দেশ্যে—শেখাবার উদ্দেশ্যে নয়। ওরা কি ভাবছে, ওদের মনে কোন কোন প্রশ্ন দানা বেঁধেছে, ওদের ভাবনা-চিন্তার বিষয়-বস্তুটা আমার জানা চাই। তাই শিবিরে শিবিরে জানতে চেয়েছি ওরা কেউ কবিতা লিখছে কিনা, গান গাইছে কিনা, গল্প-প্রবন্ধ-নাটক লিখেছে কিনা। প্রতিটি শিবিরের পরিচালকরা আমাকে সাহায্য করেছেন। এঁদের সহযোগিতা না পেলে আমি কিছুই করতে পারতাম না। তাই এ দেরকে আমার ধন্যবাদ জানাই। বাঙলাদেশের তরুণ সন্তানেরা দেশকে মুহর্তের জন্যেও ভোলেন নি। গানে কবিতায় প্রবন্ধে বাঙলাদেশকে ওরা মূর্ত করে তুলেছে। এমন কোনও শিবির নেই, যেখানে কবি নেই, গায়ক নেই, অভিনয় করবার লোক নেই। ভাবি, যে-হাত রাইফেল ধরছে, সে-হাতেই কলম চলছে। অসি ও মসীর পার্থক্য ওরা ঘুচিয়ে দিয়েছে অথচ আমার মত সুযোগ-সন্ধানী বুদ্ধিজীবী আজও অবধি প্রাক্তন সুখের দিনগুলোর কথা ভেবে জাবর কাটছেন!

'আমার দেশ তোমার দেশ বাঙলাদেশ বাঙলাদেশ'

ঘুরতে ঘুরতে এক শিবিরে দেখা হোল কবি নওয়াব আলীর সঙ্গে। বাংলাদেশ তাঁর কবিতায় রূপ নিয়েছে এভাবে ঃ

'বঙ্গ আমার জননী আমার
আমার জন্মভূমি,
স্বর্গ হতে গরীয়সী মা
প্রাণ হতে প্রিয় তুমি।'

এই কবিরই লেখা,

'বাংলাদেশ বাংলাদেশ
সবার উর্ধ্বে বাংলাদেশ
জানুক মানুষ সর্বলোকের
দেশবিদেশ
সব কথারই সর্বশেষ
মোদের সোনার বাংলাদেশ
বাংলাদেশ।'

বাংলাদেশই যেন কবির ধ্যান, জ্ঞান, জীবন। সব কথারই সর্বশেষ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ। বাঙলাদেশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা ভাষার কথা। কবি এম, ডি, শাহাদাত হোসেন লিখেছেন

বাংলা মোদের জন্মভূমি
বাংলা মুখের ভাষা,
বাংলার বুকে লুকিয়ে আছে
কতই নবীন আশা।

সন্তান। এতদিন তাদের অঙ্গে ছিল দাসত্বের খোলস। ২৪ বছরের অভিশাপ থেকে আজ তাদের মুক্তি ঘটেছে। খোলস ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে চব্বিশ বছর বয়সের দিব্য তারুণ্য। আজ আর তাদের রোখে কে? ওরাই হতভাগিনী বাংলাদেশকে নিয়ে যাবে স্বাধীনতার আলোকোজ্জ্বল মহা-মহীয়ান পথে। যৌবনের মুক্তিতেই দেশ-মাতৃকার মুক্তি।

না মুক্তিবাহিনীকে সংখ্যায় নয়, গুণগত উৎকর্ষেই চিহ্নিত করতে চাই। ওরা শুধু সংখ্যা নয়, দেশপ্রেম ওদেরকে অনির্বাণ অগ্নিশিখায় পরিণত করেছে।

(পাঁচ)

মুক্তিবাহিনীর শিবিরে শিবিরে ঘুরছি। ছেলেদের সঙ্গে কথা বলছি। ওদেরকে জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করছি। ওদের কাছ থেকে শেখার চেষ্টা করছি। এতকাল ওদের বয়সী ছেলেদেরকে আমি পড়িয়েছি আর আজ আমি ওদেরই ছাত্র হয়েছি। মনে মনে ভেবেছি, যুদ্ধ আর যুদ্ধাস্ত্রের আমি কিই-বা বুঝি! ওসব ওদের কাছ থেকেই শিখতে হবে। বিনীত বাধ্য ছাত্রের মতই শিবিরে শিবিরে গিয়েছি শেখবার উদ্দেশ্যে—শেখাবার উদ্দেশ্যে নয়। ওরা কি ভাবছে, ওদের মনে কোন কোন প্রশ্ন দানা বেঁধেছে, ওদের ভাবনা-চিন্তার বিষয়-বস্তুটা আমার জানা চাই। তাই শিবিরে শিবিরে জানতে চেয়েছি ওরা কেউ কবিতা লিখছে কিনা, গান গাইছে কিনা, গল্প-প্রবন্ধ-নাটক লিখেছে কিনা। প্রতিটি শিবিরের পরিচালকরা আমাকে সাহায্য করেছেন। এঁদের সহযোগিতা না পেলে আমি কিছুই করতে পারতাম না। তাই এ দেরকে আমার ধন্যবাদ জানাই। বাঙলাদেশের তরুণ সন্তানেরা দেশকে মুহর্তের জন্যেও ভোলেন নি। গানে কবিতায় প্রবন্ধে বাঙলাদেশকে ওরা মূর্ত করে তুলেছে। এমন কোনও শিবির নেই, যেখানে কবি নেই, গায়ক নেই, অভিনয় করবার লোক নেই। ভাবি, যে-হাত রাইফেল ধরছে, সে-হাতেই কলম চলছে। অসি ও মসীর পার্থক্য ওরা ঘুচিয়ে দিয়েছে অথচ আমার মত সুযোগ-সন্ধানী বুদ্ধিজীবী আজও অবধি প্রাক্তন সুখের দিনগুলোর কথা ভেবে জাবর কাটছেন!

'আমার দেশ তোমার দেশ বাঙলাদেশ বাঙলাদেশ'

ঘুরতে ঘুরতে এক শিবিরে দেখা হোল কবি নওয়াব আলীর সঙ্গে। বাংলাদেশ তাঁর কবিতায় রূপ নিয়েছে এভাবে ঃ

'বঙ্গ আমার জননী আমার
আমার জন্মভূমি,
স্বর্গ হতে গরীয়সী মা
প্রাণ হতে প্রিয় তুমি।'

এই কবিরই লেখা,

'বাংলাদেশ বাংলাদেশ
সবার উর্ধ্বে বাংলাদেশ
জানুক মানুষ সর্বলোকের
দেশবিদেশ
সব কথারই সর্বশেষ
মোদের সোনার বাংলাদেশ
বাংলাদেশ।'

বাংলাদেশই যেন কবির ধ্যান, জ্ঞান, জীবন। সব কথারই সর্বশেষ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ। বাঙলাদেশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা ভাষার কথা। কবি এম, ডি, শাহাদাত হোসেন লিখেছেন

বাংলা মোদের জন্মভূমি
বাংলা মুখের ভাষা,
বাংলার বুকে লুকিয়ে আছে
কতই নবীন আশা।

নর সমস্ত প্রসঙ্গ বয়ান করেছেন। স্মরণ করেছেন রফিক,
ত বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষার প্রসঙ্গ এসেছে পরস্পরে
া এবং মাতৃভাষায় তফাৎ কিছু নেই।’

বুর শেখ মুজিবুর’

য় তিনি যেন এক মহান নায়ক। মুজিবুর ছাড়া বিশ্বে
ব বুঝি থাকবে না। একটা মানুষের প্রতি মুক্তিবাহিনীর
ভেতরটাকে আমি আলোয় আনতে চেয়েছিলাম আর
াখ মুজিবুর রহমান। এম. এ. আকবর হোসেন একটি

যাও রে।
ইয়া
াদাম দাও তুলিয়া রে॥

তোপ-কামানের ভয়

আমরা যত যাত্রী আ

যা

দিছি রক্ত দিব আরো

বা

মহান দেশের মহান নেত

তোম

অধীন আকবর যাত্রী হলো

ছয় দ

না, এই একটি নয়। এমনি অসংখ্য গানে শেখ মুজিবুর
মুক্তিবাহিনী ভোলেনি। বাংলাকে যে-ভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের
সেনারা। শত্রুর প্রতি চরম ও চূড়ান্ত ঘৃণা প্রকাশ করেছে মুক্তিবা

‘

খানে

মা

করছ পিণ্ডি বসে
লা আমি খাব চুষে
ঘাতে ভাঙবে পিণ্ডির সিংহাসন।
বাংলার নিশান তুলে
বাঙাল দলে দলে
ার আসুক যত খান-পাঠান।
ভাইদের রক্ত ছুঁয়ে
ছে মুক্তি ভাইয়ে২
ব রাখব এ বাংলার মান।'

ঘৃণার যে লেলিহান শিখা মুক্তিবাহিনী জ্বালিয়ে
অনেক গান, অনেক কবিতা। মুজিবর রহমান

‘জাগো জাগো নওজোয়ান
রাখো রাখো বাং
জয়বাংলারই গান গাহিয়া
স্বাধীন বাংলার তো
স্বাধীন বাংলার কর্ণ
বঙ্গবন্ধু মুজিবুর
বাঙালীদের ডাক দিয়াছে,
একসাথে হও আওয়ান

খান সেনাদের তল্পীবাহক শান্তি কমিটির সদস্য ও রা
গানে বাঙালী জনগণের উদ্দেশ্যে বলেছেন।

‘ঘরবাড়ি পুড়াইয়
সে প্রতিশোধ লই
বাংলা শ্মশান কর

ও ভাই ঘরের শত্রু
খান সেনারা বুদ্ধি ক
ও খান কাঁটা দিয়া

ক ডাক দিয়ে হালান মিয়া লিখেছেন,

নিং কর সার

রবো সংহার।'

, কৃষক। দৃঢ়হাতে রাইফেল ধরেছে সবাই—আর খান-
ভাষায়,

মারে

তে হয়।
তামারে

নতে হয়।'

র কবি মুজিবর রহমান বিশ্বাস লিখেছেন,

'তোমরা জানোনা, জা
বঙ্গবন্ধুর দু

*

৬ মাস ধইরা খুঁজলাম
বাংলার মানুষ ভাবল এ
তাঁরে পাব না
ও তাঁর মায় কান্দে বাবায়
গাছে বসে পাখি কান্দে রে,
তাঁরে পাইলাম
স্ত্রী-পুত্র সবাই কান্দে, কা
বাংলার মাটি কান্দে, তবু ক
ওরে অন্তরে দারু

শিবিরে শিবিরে এভাবে গড়ে উঠেছে সাংস্কৃতিক জীবন।
তেমনি রাজনীতির পাঠও গ্রহণ করছে। মনস্তাত্ত্বিক দিক
বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে মুক্তিবাহিনী। মুক্তিবাহিনীর প্রতি
করছে, তবে তার পক্ষে দৃঢ় মনোবল নিয়ে মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপি
মুক্তিযুদ্ধে নেমেছে। চূড়ান্ত বিজয় অপেক্ষা

তায় গানে ছড়িয়ে আছে ওদেরই ভাবনা-চিন্তা। ওদের নিকতা নেই। কিন্তু মেকিও কিছু নেই, ছলনা নেই, কোনও াছে এবং সহজ কথাকে ওরা সত্য করে তুলেছে। কতটা একজন সেনা গান শুনিয়েছিল, তাতেই সেকথা প্রকাশ ত্য নেই—কিন্তু সত্য আর সহজের মিলন হয়েছে এই গানে।

ছাত্র-ছাত্রী দলে দলে
বুক পেতে দেয় গুলির তলে গো।
মোরা মরণে আর ভয় করিনা
বঙ্গবন্ধুর মুক্তি চাই
দেশের প্রেমিক শেখ মুজিবুর ভাই

টে হয় কমলালেবু
মোদের রোগীর মুখে নাইরে সাবু গো
ারা কাঁঠাল ভেঙে কোষ খেয়ে যায়
মোদের চাষীর মুখে পড়ে ছাই।
দেশের প্রেমিক শেখ মুজিবুর ভাই।'

সাহিত্যবিশারদ [illegible] গ্রন্থাগার

সময় লাগবে না। শিবিরে শিবিরে ঘোরা আমার শেষ লবেন তো, লিখবেন তো আমাদের কথা।

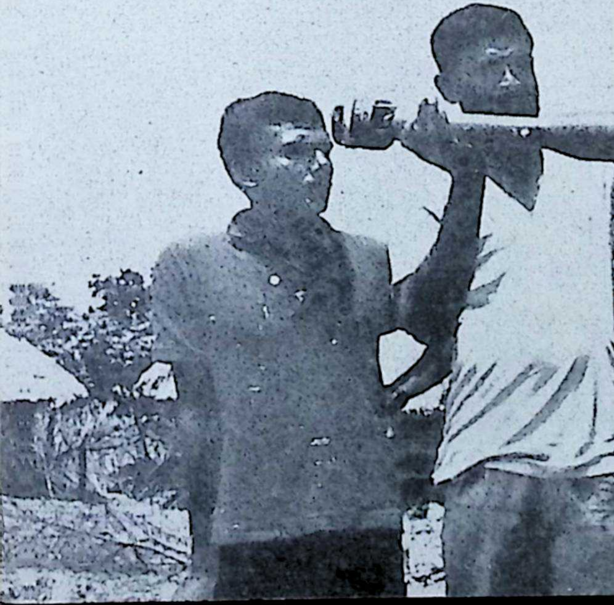

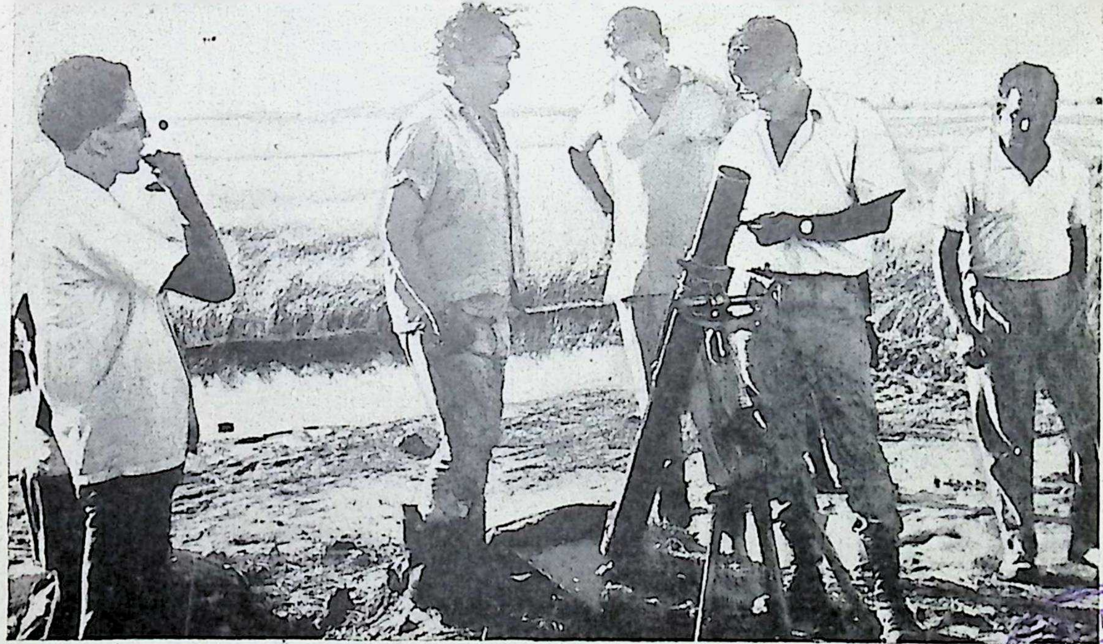

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রচার দফতরের পক্ষ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

৪১০-